# একমাত্রিক সমালোচক

**শিবাজীপ্রতিম বসু**

প্রাককথন

।। ক ।।

পর্দা ফুঁড়ে স্প্যানার হাতে বেরিয়ে আসছে চার্লি চ্যাপলিনরা, দলে দলে। ওদের লক্ষ্য জগতের যাবতীয় নাটবল্টুর দিকে। ওদের শেখানো হয়েছে, ওদের একমাত্র কর্তব্য : নাটবল্টু টাইট দেওয়া। প্রশ্নহীনভাবে, অবিরাম⋯

এই বিখ্যাত ভয়ঙ্কর রূপকচিত্র কল্পনা করে ছয়ের দশকের শেষপাদে জার্মান-মার্কিন ছাত্রকুলের চোখের মণি হারাবার্ট মারকুজে কখনো শিউরে উঠেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে তাঁর সবচেয়ে পরিচিত দার্শনিক আলোচনার বিষয়বস্তু হল, 'একমাত্রিক মানুষ', যে কেবল এই আনন্দময় ভুবনের রূপরসগন্ধ [ এবং পুরীষ ] গ্রহণ করবে ; পৃথিবীর 'অধুনা' অস্তিত্ব হবে তাদের সকল প্রজ্ঞার আকর এবং সেই প্রজ্ঞা [ ও বিশ্ববীক্ষা ] তারা পুনরুৎপাদন করে চলবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ; কখনো ঘুরে দাঁড়াবে না ; ফিরিয়ে দেবে না নিজস্ব বমন ও ভালবাসা ; উল্টো করে দেখবে না আয়নার ভিতরের অলীক অস্তিত্বকে। এককথায় তারা হেগেল বর্ণিত মানুষের 'দ্বিতীয় মাত্রাটি ( অর্থাৎ বর্জন করার সাহস বা সম্যক বিচারে বর্জন-গ্রহণের প্রক্রিয়া ) মানে 'ক্রিটিকাল পাওয়ার' হারিয়ে 'প্রত্যক্ষ' জগতের বশংবদ, অর্ধমানবে পরিণত হবে।

অতএব, মারকুজের সতর্কীকরণ : দ্বিতীয় মাত্রাটি হারিয়ে ফেলো না, আনুগত্যের নিরাপদ আশ্রয়ে বর্জনে-গ্রহণে প্রতি পলকে যাচাই করে নেওয়া নিয়ত পরিবর্তনশীল হাতিয়ারে জং ধরিও না। প্রশ্ন ও সমালোচনার অধিকারকে উদ্ধে মেলে ধরো, কারণ সমালোচনার অর্থ নানা বিন্দু থেকে বস্তুগত বা মননগত অবয়বকে অবলোকন করা, সত্যের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে সত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ কোলাজ গড়ে তোলা।

কথাগুলো, যে কোনো সচেতন মানুষের পক্ষে যদি প্রাসঙ্গিক হয়, তবে তা অবশ্য-মান্য সাহিত্যকর্মের স্বঘোষিত 'বিচারক' ; সমালোচকদের ক্ষেত্রেও। সাহিত্য রসিক কোনো পাঠক স্থান ( ভৌগোলিক / সামাজিক ), কাল ও ব্যক্তিগত [ অ ] পছন্দের ভিত্তিতে সাহিত্যকৃতি গ্রহণ-বর্জন করতে পারে, বৃহত্তর সমাজের কাছে দায়বদ্ধ না থেকে। সমালোচকও একজন পাঠক—একজন দায়িত্ববান 'বহুমাত্রিক' পাঠক, যিনি 'বস্তুসৃষ্ট বিভিন্ন অনুষঙ্গ থেকে বইটি পড়বেন' এবং তাঁর পঠন প্রক্রিয়া যেহেতু ব্যক্তি পাঠকের স্বেচ্ছাচারী পাঠ নয়, তা অনেক বেশি 'অবজেকটিভ', অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। তাই স্বৈরী বিচারকের মতো মসির একটি আঁচড়ে কাউকে নস্যাৎ করা বা মাথায় তুলে নাচার নাম সাহিত্য সমালোচনা নয়। সমালোচনার অর্থ হল দর্শন, [সমাজ]

বিজ্ঞান, ইতিহাস, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিন্দু থেকে লিখিত টেক্সটের বিভিন্ন পাঠান্তর উপস্থাপন করা এবং রলাঁ বার্থ আমাদের শিখিয়েছেন, যেহেতু সাহিত্যের ভাষা স্বয়ং বাস্তবতা নয়, বাস্তবতা সম্বন্ধীয় মন্তব্য বা ধারাভাষ্য, তাই সমালোচনার ভাষা—যা ওই [ বাস্তবতা সম্বন্ধীয় ] মন্তব্যের ওপর আরেকটি মন্তব্য বা ধারাভাষ্য—তা একটি দ্বিতীয় মাত্রিক ভাষা বা 'মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ'[১] [ যেহেতু তা 'মন্তব্যের ওপর মন্তব্য' ], তাই লিখিত বস্তুর [ বাস্তব নির্ভর ] সত্যাসত্য বিচার নয়, লিখিত গদ্য / পদ্যের আভ্যন্তরিক যুক্তি কাঠামোটি কতদূর সবল বা দুর্বল, তা বিচার করাই সমালোচনার প্রধান প্রতিপাদ্য। একই বিচারে লেখকের ব্যক্তিপরিচয় [ যেমন, বঙ্কিম কোথায় ডেপুটি থাকাকালীন কোন উপন্যাস রচনা করেন ] বা তাঁর চরিত্র [ যেমন, শক্তি চট্টোপাধ্যায় দিনের কতটা সময় খালাসিটোলায় কাটান বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়রা কোন-কোন সমালোচককে নিয়মিত কুর্ণিশ করেন ] তাঁর সাহিত্যকৃতি পাঠ ও সমালোচনার ক্ষেত্রে অবান্তর বিষয়।

॥ খ ॥

পত্র-পত্রিকায় সাম্প্রতিক বাঙলা গদ্য সমালোচনা বিষয়ে এ প্রবন্ধের অবতারণা। গদ্য বলতে এখানে মূলত Fiction-কে বোঝানো হয়েছে, পত্র-পত্রিকা বলতে বোঝানো হয়েছে বাণিজ্যিক / বহুল প্রচারিত / পঠিত পত্র-পত্রিকার কথা এবং 'সাম্প্রতিক' বলতে বিগত এক বছরে প্রকাশিত কয়েকটি সমালোচনার খতিয়ান। বর্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসর ও আমাদের শারীরিক-বৌদ্ধিক সীমাবদ্ধতা এইসব শর্ত আরোপের প্রধান কারণ।

বহুল প্রচারিত বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকারও কিছু স্বতঃসিদ্ধ নির্ধারক/সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, পাঠক সমাজের গড় রুচি ও মান অনুযায়ী লেখা, ফলে, বহু সংবাদ, তথ্য, ফিচারের চাপে 'সমালোচনার' ( যাকে 'ক্রিটিসিজম' না বলে 'রিভিউ' বা 'পুস্তক পরিচিতি' বলা ভাল ) ক্ষুদ্র পরিসর এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক স্বার্থবুদ্ধি—যা পূর্বোক্ত নির্ধারকগুলির নিয়ন্তা এবং নিজস্ব ( প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গোষ্ঠী ) স্বার্থবিরোধী রচনা বরদাস্ত করে না।

অন্যদিকে পাঠককুলের বহুস্তরী বিস্তৃতির জন্য লঘু জলবৎ লেখার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সিরিয়াস প্রবন্ধ / সমালোচনাও বৃহৎ পত্রিকার পাতাগুলি প্রশ্রয় দেয়। ফলে, পপকর্ন চিবুতে চিবুতে শেষ করা যায় এমন রচনার পাশাপাশি থেকে যায় 'সিরিয়াস' লেখকদের এমন অনেক রচনা, যা 'ধুত্তোর' বলে ফেলে দেওয়া যায় না। এই শেষোক্ত রচনা সমূহের কয়েকটি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু এবং/ অতএব আমাদের রচনা হল, মেটা-মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ।

---

১. বার্থের মতে, বাস্তবতার ধারাভাষ্য ( comment ) হল 'প্রাথমিক' ভাষা [ অর্থাৎ সাহিত্য ]। 'সমালোচনা' ও একটি ভাষা, যার মূল দায়িত্ব ওই 'প্রাথমিক' ভাষার ওপর মন্তব্য করা / ধারাভাষ্য দান, ফলে তা মাধ্যমিক ( Secondary ) ভাষা বা *Meta* language,

এক

'সাতের দশক শুধু অগ্নিমূর্তিই ছিল না, সে অগ্নিকাণ্ডও ঘটিয়েছে কিছু কম নয়। সে এসেছিল অনেক পুরনো ভাব-প্রতিমা ভাঙতে ভাঙতে, সে ধরিয়ে দিয়েছিল আমাদের বহু প্রবঞ্চনার স্বরূপ।...আজ যখন গত দুই দশকের কথা সাহিত্যের মূল্যায়ন জরুরি হয়ে পড়ে একবিংশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তখন সেই প্রথম সত্তরের উত্থাপিত জিজ্ঞাসাগুলির অন্তত এই চাক্ষুষ জরিপও দরকার। এজন্য দরকার যে, **সেদিন যে সমস্যা ছিল বাস্তবেরই ছুঁড়ে দেওয়া নানা চ্যালেঞ্জ, সেটাই কথাশিল্পে দেখা দিল ফর্মের সমস্যা হিসাবে**।......গোল গল্পের দিন টোল খেতে খেতে ভেঙে গেল। দেশ ভেঙেছে, পার্টি ভেঙেছে—ভেঙেছে সমস্ত দিক থেকে নিয়ামক নিশ্চিন্ততা—বৃদ্ধেরা উপেক্ষায় বিবর্জিত, যুবকেরা স্বপ্নহত। **এমন অবস্থায় সৃষ্ট হয়েছে যে সাহিত্য তার মূল্যায়ন জীবনভাষ্যের মূল্যায়ন বলেই ভাষ্যকারকে জীবনের প্রেক্ষাপটেই বুঝে নিতে হবে।** এখানে যে সমস্ত কথা বলা হল, সে সমস্তই ছিল সে ভাষ্যকারের সেদিনের অস্তিত্বের অংশ।' [ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিপন্ন সীমান্ত : উদ্বিগ্ন সৈনিক', **দেশ** ১১ বৈশাখ, ১৪০০ ; মোটা হরফগুলি ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধলেখক দ্বারা। ]

অর্থাৎ, দেশ ভাঙছে, পার্টি ভাঙছে, সমাজ ভাঙছে = গল্প [ এবং ফর্ম ] ভাঙছে—ইত্যাকার প্রায় সমীকরণ উদ্ধৃত প্রবন্ধের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি। যদিও 'দেশ' সত্তরে ভাঙেনি—পাকিস্তান ছাড়া [ এবং তা ভেঙে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ তো সত্তরের প্রথমার্ধে রোমান্টিক আশাবাদের কল্প-বাস্তব দেশ ] ; পার্টিও [ যদি তা কমিউনিস্ট বা কংগ্রেস হয় ] ষাটে ভেঙেছে, সত্তরে নয় ; সামাজিক ভাবপ্রতিমা ভাঙাভাঙির সূত্রপাত আরো আগে। তাহলে 'এমন অবস্থায় সৃষ্ট হয়েছে যে সাহিত্য' তার সূচনা তো ষাটের দ্বিতীয়ার্ধেই ঘটে যাওয়ার কথা ( কারণ, বাস্তবের 'ছুঁড়ে দেওয়া নানা চ্যালেঞ্জ'), 'সত্তর' অব্দি অপেক্ষা করতে হল কেন, দশকওয়ারি 'মূল্যায়ন' পেশ করতে হবে বলে ?

আসলে 'বাস্তববাদী' লাঁসোঁনীয়[২] (Lansonian) সমালোচনার প্রধান অসুবিধা এইখানে। যতই গভীর সুবেদী লেখক হোন বা সাহিত্যিক পরিভাষা যতই তাঁর দখলে থাকুক, শেষপর্যন্ত [ নিজের অজান্তে ] এই রকম অস্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে ধরে নেন, লেখকরা 'যদ্দৃষ্টং [ ফর্মের একটু মোচড়ে ] তল্লিখিতং'। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে 'জীবনী' মানেও তো স্বয়ং 'জীবন' নয় আর গল্প-উপন্যাস—যা কোনো সময়ই বাস্তবজীবনের অর্ধকল্পিত ধারাভাষ্য বই কিছু নয়, তার উৎস সন্ধানে যদি বারবার স্বয়ং জীবনের [ তাও সমালোচক মশাইয়ের পছন্দসই জীবনের ] কাছে ফিরে যাই তাতে না হয় ইতিহাসচর্চা, না হয় সাহিত্যের বহুমাত্রিক পাঠ-বিচার।

২. গুস্তাভ লাঁসোঁ ( ১৮৫৭-১৯৩৪) ছিলেন ফরাসি সাহিত্য সমালোচনা জগতে বাস্তবতাপন্থীদের অন্যতম গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। এঁর মতে, সাহিত্য বুঝতে হবে লেখকের জীবন ও পরিপার্শ্ব অনুযায়ী, লেখক সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে লেখকচরিত খুঁজে পাওয়া যাবে।

সুতরাং গল্প উপন্যাসের সত্য-মিথ্যা বিচার করতে হবে প্রদত্ত গল্প-উপন্যাসের যৌক্তিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে। সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, রচনাশৈলী প্রভৃতি নানান বিন্দু থেকে তার পাঠান্তর সম্ভব, কিন্তু বাস্তব ও সাহিত্যের সম্পর্ক একধরনের 'বিম্ব-প্রতিবিম্বের' সম্পর্ক—'একবিংশের মুখোমুখি' দাঁড়িয়ে এমন ধারণা অনাধুনিক। [ অথচ দীর্ঘদিন ধরে প্রখ্যাত ফরাসি সমালোচক লাঁসোঁ ও তাঁর ভাবশিষ্যরা এই দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকেই সাহিত্য বিচার করেছেন, অর্থাৎ, তাঁদের মতে, বস্তুজগতের বাস্তবতার ভিত্তিতে কাহিনীর (fiction) বাস্তবতা বিচার করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, লেখক সৃষ্ট চরিত্রগুলি আসলে লেখকের চরিত্রেরই নানা রূপ, যেগুলো সঠিক-ভাবে মেলালে লেখকের জীবন ফুটে উঠবে। ]

যদিও আমাদের সাহিত্য আলোচনার জগতে রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, কবিকে তার জীবনচরিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু এদেশে বহু বিদগ্ধ [ বেনামা ] লাঁসোঁপন্থী সেভাবেই সমালোচনার ঝড় তুলেছেন। এর মধ্যে যদি কারো মার্কসবাদী [ সরলীকৃত ] ইতিহাসের গুরভাগটা রপ্ত হয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই। একবার বিচার্যলেখার রচনাকাল জানতে পারলেই হয়ে গেল। অতঃপর সেইকালের সামাজিক [ ও বৈপ্লবিক ] চরিত্র বিশ্লেষণ করে কিছু নিয়ামক নির্দিষ্ট করতে পারলেই কেল্লা ফতে। তখন বলতে পারা যাবে, অমুক সময়, অমুক লেখক অমন লেখা কেন লিখলেন, না 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া' ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে, অথবা নয়া ঔপনিবেশিক পণ্য সর্বস্বতার ফলস্বরূপ। এতে সুবিধা হল এই যে, প্রচুর পরিশ্রম বেঁচে গেল, অথচ কেবল একটি কলম ও বিশ্ববীক্ষার জোরে দিস্তা দিস্তা সাহিত্য পর্যালোচনা প্রকাশ করা গেল। অন্য পথটা যে এত সহজিয়া নয়, কিছুদিন আগে ডেভিড লজ হেমিংওয়ের একটি ক্ষুদ্র গল্প—'ক্যাট ইন দ্য রেইন' পর্যালোচনার সময় দেখিয়েছেন কত জটিল, পরিশ্রমসাধ্য অথচ বুদ্ধিদীপ্ত ও আকর্ষক সেই পথ। হেমিংওয়ের মূল গল্পটির যুক্তিকাঠামো আলোচনা করেই লজ ক্ষান্ত দেন-নি, দু-তিনটি ভিন্ন বিন্দু [ বিভিন্ন চরিত্রের perspective থেকে ] থেকে তিনি মূল গল্পটিরই পুনর্গঠন করেছেন দু-তিনবার, সেগুলি পড়লে বোঝা যায়, কেবল লেখককেই নয়, ভাল লেখার জন্য সমালোচককেও 'অনেক রক্তপাত' ঘটাতে হয়।

বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'শ্রীকুমার' পন্থী সমালোচনার বদলে এক ঝলক তাজা বাতাস এনেছিলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে। কিন্তু সেই গ্রন্থ থেকে অন্যান্য বহু সমালোচনার ফুটে উঠল তাঁর তাত্ত্বিক কেন্দ্রভূমি, যা সিরিয়াস গদ্যের আড়ালে, সহজমর্মী আলোচনায় বিশ্বাসী।

গত ২৯ ফাল্গুন ১৩৯৯-এর **দেশে** সমরেশ বসু [ অসমাপ্ত ] শিল্পী রামকিঙ্করের জীবনভিত্তিক উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে'র সমালোচনায় সরোজবাবুর তাত্ত্বিক অবস্থান আরো স্পষ্ট হয়। এই রচনায় সমালোচক [ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ] নিজেই একজন চরিত্র : 'সমরেশের কিন্তু পরিকল্পনা ছিল আরও বড় মাপের একটা ব্যাপার

দাঁড় করাতে হবে। এ সূত্রে যে পরিকল্পনা সমরেশের ছিল তা হয়তো কিছুটা অনুমান করতে পারা যায় আমাকে লেখা ৮-১২-৮৬ দিনাঙ্কিত একটি চিঠি থেকে। চিঠিতে সমরেশ আমাকে বলছেন…'—এটুকু পড়ে মনে হতেই পারে, ভাগ্যিস সরোজবাবু আলোচনা করলেন, নইলে এ 'রিভিউ' অন্য আর কে করত! কারণ, তাদের কাছে তো সমরেশের ব্যক্তিগত চিঠি ছিল না। তাই তাদের 'আমি' জাতীয় কোনো প্রাতিস্বিক অহং এরও বালাই নেই, যদিও উদ্ধৃত চিঠিটি মূল্যবান, সন্দেহ নেই।

শুধু এই নয়, সুন্দর বাক্য বিন্যাসে গড়া রচনাটির ছত্রে-ছত্রে সমালোচক—লেখকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং উপন্যাস ও লেখকের জীবনের যোগাযোগ খোঁজার চেষ্টা চলেছে।

'…একথা আমার মনে করার কারণ আছে যে, সমরেশের ভাগ্যবিধাতা সমরেশকে দিয়ে এ-কাজ করিয়ে নেবেন বলে যেন তা আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল। কিশোর সমরেশ বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। তিনি আর্টিস্ট হবেন। আর্ট স্কুলে ভর্তি হবেন।… অত্যন্ত দুরন্ত ছেলে ছিল সে। আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাইপো অনাদিভূষণ ভট্টাচার্য সেই দুরন্ত ছেলেটিকে খুব স্নেহ করতেন। সমরেশের দুরন্তপনা সামাল দেবার জন্য মাস্টারমশাই সমরেশকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওর হাতে তুলে দিয়েছিলেন পাশ্চাত্য চিত্রকলার মূল্যবান বই। তখনও ছবিই ছিল সমরেশের প্রধান 'প্যাশান'। …প্রথমা পত্নী গৌরী বসুর একটি রঙিন প্রতিকৃতি এখনও বোধহয় হারিয়ে যায় নি, সুতরাং বলা যেতে পারে ছবির জগৎ তাকে হাতছানি দিয়েছে ছোটবেলা থেকে।'

শুধ চিত্রকলা নয়, বাঁকুড়ার ডায়ালেক্ট নিয়ে সমরেশের ব্যক্তিগত পাঠও আছে সমালোচকের স্মৃতিতে এবং সবশেষে তিনি লেখক সমরেশ ও লিখিত রামকিঙ্করের জীবনেরও অভেদ ঘটিয়েছেন। 'লেখক সমরেশ ও শিল্পী রামকিঙ্কর অভেদ সিদ্ধ ছিলেন জীবনে।… রামকিঙ্করের মতোই অপমান লাঞ্ছনায় হার মানেননি সমরেশ। একদা দারুন লড়াই করেছেন দারিদ্র্যের সঙ্গে। রামকিঙ্কর যেমন শিল্পকে, সমরেশও তেমনি সাহিত্যকেই একমাত্র অবলম্বন করে লড়াই করে গিয়েছেন, যা একালের আর কোনও লেখক করতে পারেন নি। [ জানি না, 'একালের আর কোনও লেখক' বলতে সরোজবাবু কাদের কথা বুঝিয়েছেন। কেবল গণমাধ্যম নির্ভর জনপ্রিয় সাহিত্যকুলের কথা? ] তাই রামকিঙ্করের মধ্যেই সমরেশ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মনের মানুষকে, বোধহয় নিজেকেও'। এখানেই শেষ নয়, আরও আছে :

'এখানেও লেখক সমরেশের সঙ্গে তাঁর [ অর্থাৎ রামকিঙ্করের ] ভাবৈকরস—যা দেখা যাচ্ছে। সেটাই সব নয়, আরও আছে, বুঝি ভিতরে আছে—সমরেশ জেনেছিলেন, বুঝেছিলেন তা নিজের আলোয়। নানা মূর্তির সমারোহ সমরেশেরও চরিত্র-চিত্রমালায়'। এরপরই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশ-রামকিঙ্কর সত্তার একটি মোক্ষম প্রশ্ন তুলেছেন :

'বাস্তব মানে কি অবিকল ? কোথায় যেন একটা তফাৎ আছে…' —এই **তফাৎটুকু**—যা শিল্পমাধ্যম রচনা করে, তা যে একটি নির্মিত-কল্পিত বাস্তব অর্থাৎ তার একটি নিজস্ব অবয়ব আছে, একটি নিজস্ব যুক্তিক্রম আছে, যার দুর্বলতা-সরলতার ওপরেই লিখিত গদ্যের গুণাগুণ নির্ভর করে—এ কথার ওপর মুখ্যগুরুত্ব না দিয়ে বাস্তববাদী সমালোচক খুঁজে চলেন লেখার আড়ালে লেখককে, অথবা কোনো দশকের বেছে নেওয়া সমস্যাকে তাঁরা বসান সাহিত্যের নায়কের আসনে।

অবশ্য সমালোচনার ঘরানা বাছবার অধিকার সমালোচকের আছে। কিন্তু দশকওয়ারি বাঙলা উপন্যাস আলোচনায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ঘরানা অনুযায়ী বিশ্লেষণও কি বজায় রাখতে পেরেছেন ? নতুবা সাতের দশকের 'উত্থাপিত জিজ্ঞাসাগুলির' সন্ধান তিনি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পান কোন ম্যাজিকে ? বাস্তববাদীদের মতোই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, এই বিস্ময়কর ব্যবস্থার (accommodation) 'পিছে ক্যা হ্যায়' ? প্রাতিষ্ঠানিক সৌগন্ধ ? জানি না, তবে যে ভাবে তিনি জনা কুড়ি প্রবীণ-নবীন লেখকের সাহিত্যকৃতির আলোচনা করেছেন, তাতে রসজ্ঞ পাঠকের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরীতে লেখা উপন্যাস রচনার সহজ-মজার কৌশলটির কথা মনে পড়তে পারে। মানিক বলেছিলেন, উপন্যাস লেখার আগে মূল চরিত্রগুলির নাম একটা কাগজে লিখে, তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী সংখ্যা ( পাওয়ার ) বসাতে হবে। যেমন, 'ক' এর পাশে ১০০০, 'খ' এর পাশে ১০০—এই সংখ্যাই বলে দেবে কে কত পাতা অধিকার করবে বা কার বরাতে জুটবে দু-এক লাইন। এই পদ্ধতি আত্মস্থ করে তিনি যেভাবে দুচার শব্দ প্রয়োগে কারো ওপর 'ধোঁতি' ( শব্দটির নতুন ব্যঞ্জনার জন্য আমরা শিশির দাশের কাছে কৃতজ্ঞ ) প্রয়োগ করেছেন বা কারো ওপর চাপিয়েছেন প্রশংসার নতুন প্রলেপ, তা থেকে অনুজ কলমচিরা অনেক শিখতে পারবে। যেমন, (১) "সুব্রত মুখোপাধ্যায় 'রসিক' উপন্যাসে সমরেশ বসুর জোব্বাটাকে গায়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেটা তাঁর গায়ে ঢলঢল করছে।" [ সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নাম না করে সমালোচক অন্যত্র একই মন্তব্য করেছেন। ] ; (২) "'পূর্ব-পশ্চিম' সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির আত্মানুসন্ধান, এই উপন্যাসে কখনও-কখনও ইতিহাস ও মানুষ একাকার হয়ে গেছে। তথাপি এক অভাবনীয় অকাল সন্ধ্যায় কালান্তরের মুদ্রিত পাঞ্জায় চরিত্রগুলি জীবিতকল্প। এমন বিস্তার নিয়ে আর কোনও বাংলা উপন্যাস লেখা হয়েছে বলে জানি না।" সরোজবাবু বাস্তববাদী বলেই এই প্রসঙ্গে বলতে সাহস পাচ্ছি, বেশ কিছুদিন আগে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে 'পূর্ব-পশ্চিমের' একটি মিঠে-কড়া সমালোচনা বেরিয়েছিল, যার সম্পর্কে সুনীল সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে ( আ. বা. পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ১২।১২।৯৩ ) ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন, সরোজবাবুর লেখায় তার কিছুটা উপশম হওয়ার কথা ছিল।

দুই

সম্প্রতি আর একজন সমালোচক [ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, **দেশ**, ২৫ সেপ্টেম্বর, ৯৩ ]

অতি সোচ্চারে বাস্তবতাবাদী [ জানি না, কেন লেখায় তিনি ‘বাস্তববাদী’ কথাটি ব্যবহার করলেন ] প্রকরণ ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি খানিক আরোপিত কর্তৃত্বময় কথার ফুলঝুরি শুনিয়েছেন। শুরু থেকেই উদ্ধৃতি দিতে হল : ‘উপন্যাস ভাল বা মন্দ হয় কিসের গুনে ? অবশ্যই জীবনানুগ বাস্তববাদী উপস্থাপনার গুণে।’ পাঠক লক্ষ করবেন, পরপর ব্যবহৃত ‘জীবনানুগ’ ও ‘বাস্তববাদী’ শব্দ দুটি। তাহলে স্যাঁৎ এক্সুপেরির ‘ছোটরাজপুত্র’ শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ভাল উপন্যাস নয়, ‘অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড’ই বা কোন পর্যায়ভুক্ত ? তবে আলোচ্য রচনা-লেখকের একটি শৈলী যথেষ্ট আয়ত্ত আছে। তা হল, কোনো সহজিয়া প্রশ্ন নিক্ষেপ এবং তার চটজলদি কর্তৃত্বপূর্ণ উত্তরদান, [ পাঠক, আপনারা সকলেই যে পাঠশালার গবেট ছাত্র, এ ধরনের লেখা না পড়লে তা মনে থাকে না। ] আরো উদ্ধৃতি :

(ক) “বিষয়বাদীরা বলবেন উপন্যাসের উৎকর্ষ নিহিত থাকে বিষয়ে। কথাটা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, প্রকৃত উপন্যাসে [ পাঠক, আবার খেয়াল করুন ‘প্রকৃত’ ও ‘ভাল’র পাশাপাশি অবস্থান—কী বিশুদ্ধতাবাদী প্রয়াস! ] বিষয় আর ফর্মটাকে কি পৃথক করা যায় ? বলা বাহুল্য বিষয় আর ফর্মের সম্পর্কটা অনেকটা সীবন শিল্পে ছুঁচ-সুতোর সম্পর্কের মতোই [ হা হতোস্মি ! অবশেষে অ্যানালজি ! ]··· জীবনের মাইমেটিক ছবি তুলে ধরার একটি শিল্প আছে, একটা টেকনিক আছে ঠিকই ; কিন্তু উপন্যাসে যেন টেকনিক-সর্বস্বতার ছাপ না ফুটে ওঠে [ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় হুঁশিয়ার !] ফর্ম এবং বিষয় সূক্ষ্ম এবং নিবিড়ভাবে [ পাঠক আবার পাশাপাশি শব্দ দুটির দিকে তাকান ] মিশে যাওয়াটাই কাম্য।”

(খ) “‘ভাল’ বা ‘মন্দ’ নয়, উপন্যাসের একটাই শ্রেণী বিভাজন হতে পারে—যে উপন্যাসে জীবন নেই এবং যে উপন্যাসে জীবন আছে। বলা বাহুল্য, জীবন ও বাস্তবতা এখানে সমার্থক।”

এইভাবে পরস্পর-বিরোধী নিরর্থক বাগাড়ম্বরে [ বাঙলার সঙ্গে ‘execution’, ‘air of reality’, solidity of specification’—ইত্যাকার ঈঙ্গ শব্দেরও ছড়াছড়ি—অবশ্যই, অজ্ঞাত কারণে ] আলোচ্য লেখক কেবল বাস্তবতাবাদের জয়গানই গান না, আলোচ্য গ্রন্থগুলির মাথায় চাপিয়ে দেন ‘বাস্তববাদী’ উপন্যাসের তকমা, তারপর নিজেই বিচার করতে বসেন ‘বাস্তববাদী’ উপন্যাস হিসেবে তাদের সার্থকতা, ব্যর্থতা।

## তিন

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় যদি তাত্ত্বিক ফ্লেবার পরিবেশন করার পণ্ডশ্রম করে থাকেন, তবে কোনো তত্ত্বের বড়াই না করেও নলিনী বেরা স্বল্প পরিসরে (**প্রতিক্ষণ,** এপ্রিল, ১৯৯৩) আসল কাজটি করেছেন—উপন্যাস [ অমর মিত্রের লিখিত ] কাঠামোর মধ্যেই তার সত্যাসত্য গুণাগুণ দেখার চেষ্টা করেছেন। তবে তার ভিতরেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর সমালোচনা তত্ত্ব :

‘অমর চাকরিসূত্রে রাঢ় অঞ্চলে পরিভ্রমণ করলেও মূলত তিনি ঔপন্যাসিক, তাঁর চোখ

যথার্থ সাহিত্যিকেরই। হামেশাই শুনি, যেহেতু চাকরিসূত্রে তাঁর ঐ অঞ্চলে ভ্রমণ, কাজেই তৎ-লিখিত তৎ-বিষয় ভিত্তিক গল্প উপন্যাসও ট্যুরিস্টের চোখ দিয়েই লেখা—আমি এরকম ধারণায় একমত নই।'

তার মানে, লেখকের জীবনযাত্রাভিত্তিক সমালোচনা লেখার যে প্রচুর [ পণ্ড ] শ্রমসাধ্য ধারাটি বাস্তববাদীদের অহংকারী অধিকার, নলিনী এক্ষেত্রে তাকে অন্তত নস্যাৎ করেছেন। রচনার শেষদিকেও শ্রী বেরা আর একটু বলিষ্ঠভাবে একই চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন : "একাধিক উহ্য-অনুহ্য কারণে সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকায় গ্রামভিত্তিক গল্প ছাপাছাপির বাহুল্য দেখা দেওয়ায় অনায়াস ক্ষমতালিপ্সু অত্যুৎসাহী তরুণ তরুণতর লেখকের দল নিজ নিজ রচনাটিকে আরো বেশি মাত্রায় 'রিয়েলিস্টিক' করে তোলার বাসনায় ব্রাত্যজনের মুখের 'ডায়ালেক্ট' লেখার সময় যাহোক তাহোক ভাবে ক্রিয়াপদের শেষে 'ক' 'য-ফলা' 'চন্দ্রবিন্দু' ইত্যাদির সংযোগ ঘটিয়ে লেখাটিকে দুর্বোধ্যতর করে গড়ে তুলেছেন। সখেদে বলতেই হচ্ছে—যাদের মুখের 'ডায়ালেক্ট' বসাতে এত তঞ্চকতা, পরিবেশের 'ফ্লেবার' তোলার বাসনায় এত কষ্ট সহিষ্ণুতা—সেই তারা লেখাপড়া শিখে যদি কোনদিন 'আপনার মুখ আপনি দেখে' তবে সে যে বড় লজ্জার হবে, তরুণ লেখক বন্ধুরা।"

বিগত এক বছরে বৃহৎ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প উপন্যাসের আলোচনার ক্ষেত্রে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাসের সমালোচনার ( **দেশ** ১১ বৈশাখ ১৪০০) অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। বর্তমান প্রবন্ধের শুরুতে আমরা একমাত্রিকতা বনাম দ্বি / বহুমাত্রিকতার যে সমস্যা উত্থাপন করেছিলাম সেখান থেকেই পার্থপ্রতিম তাঁর লেখা শুরু করেছেন। মুখ্যত তিনি সাহিত্যে '**জনপ্রিয়তা**' ও 'বাণিজ্যায়নের' যোগসূত্র অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন যে যদিও অতীতে জনপ্রিয় ও সিরিয়াস উপন্যাসের মেরুকরণ হয়নি, কিন্তু সাম্প্রতিক দশকগুলিতে একমাত্রিকতা, জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যায়নের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সমীকরণ ঘটে গেছে। এবং এই সমীকরণের প্রধান অনুঘটক হল ভাষা। এই কারণেই পার্থপ্রতিম নিম্নোক্ত সাহসী মন্তব্য করতে পারেন :

**'উপন্যাস শেষ পর্যন্ত ভাষা ছাড়া কিছু নয়। উপন্যাসের অর্থ, যাকে বিষয় বলা যায় তা বিশেষ অর্থে কনটেন্ট হয়ে ওঠে ঐ ভাষা, ফর্মের কাঠামোর চাপে।'** [ মোটা হরফ বর্তমান লেখকের ] এত বেশি আধুনিক কথা সাম্প্রতিক কালে খুব কম সমালোচক বৃহৎ পত্রিকায় লিখতে পেরেছেন। তিনি জানান, 'জনপ্রিয় উপন্যাসে এই ভাষা ও ন্যারেশান খুব বড় ব্যাপার। সুনীলের জনপ্রিয়তার প্রধান ভিত্তি তাই, তিনি এমন একটি ভাষায় লেখেন, যাতে হোঁচট খেতে হয় না, ভাবতে হয় না। তরতর করে পড়া যায়। এ ভাষার ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা অবশ্যই আছে : জীবন-শিল্পের দ্বান্দ্বিক দুন্দুভিতে এ ভাষাই সর্বভারক্ষম এক ভাষায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু সুনীলের উপন্যাস ঐ দুন্দুভি বাজাতে চায় না। তার লক্ষ্য অন্য : তাই ঐ সম্ভাবনাকে ভেঙে

দেন। অথচ ঐ সম্ভাবনার কথাও জানিয়ে দেয় ক্বচিৎ কখনও…'। এরপর পার্থপ্রতিম সুনীলের দুটি ভাষার পার্থক্য দর্শান : একটি ভাষায় আছে 'কবিতার স্পর্শ', উপন্যাসের কবিতা', অন্যটির উদ্দেশ্য 'খবর দেওয়া, ইনফর্মেশন মিডিয়ায় নিমজ্জিত মধ্যবিত্ত পাঠক এটাই চায়, ভাষার এই তরল ভারহীনতা। আর এই ভাষায় সুনীল চলচ্চিত্রের মতো সব কিছু দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে চান।' এরপর তিনি দেখান কীভাবে বিভিন্ন সিরিয়াস ইস্যু, যেমন ফেমিনিজম বা নকশাল আন্দোলন সুনীলের উপন্যাসে জনপ্রিয়তার উপাদান হিসেবেই প্রক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার হয়। এর সঙ্গেই আরেকটি উপাদানের ( যৌনতা ) হিসেবি ব্যবহারের উদাহরণ দেন : 'কালচার ইন্ডাস্ট্রির এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত রূপ সিনেমায় জনপ্রিয়তার উপাদান তিনটি, গোলগল্প, ভায়োলেন্স ও যৌনতা। উপন্যাসে প্রথম ও তৃতীয়টির দক্ষ ব্যবহার দরকার, কারণ, ভায়োলেন্স দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে না পারলে আকর্ষক হয় না। সুনীল ঐ দুটি উপাদানকেই বাঙালি মধ্যবিত্তের মন ও রুচি অনুযায়ী ব্যবহার করেন'। এছাড়া, যেহেতু জনপ্রিয় উপন্যাসের অন্যতম কাজ 'খবর দেওয়া', তাই পার্থপ্রতিম সুনীল প্রদত্ত উপন্যাসে কিছু পরিচিত তথ্যগত [ বাস্তব ] অসঙ্গতির ভিত্তিতে সকৌতুক প্রশ্ন তোলেন গড় পাঠকের অজানা তথ্যগুলির ক্ষেত্রেও এইরকম ভুল আছে কিনা ?

লেখার শেষে অবশ্য পার্থপ্রতিম মাঝে-মাঝে ঝিলিক দেওয়া সুনীলের সার্থক শিল্পভাষা এবং কোনো কোনো নায়কের [ বিশেষত নীললোহিতের ] অসম্পূর্ণ স্বপ্ন/ইউটোপিয়া ও সর্বোপরি সদর্থক মানবিক আবেগের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন 'বাণিজ্যায়নের নির্বাসনেও প্রচ্ছন্ন স্বপ্ন'। তাই একটা ক্ষীণ আশাবাদ [ বাণিজ্য নিগড় ভাঙার ] নিয়ে লেখাটি শেষ হয়েছে।

চার

অতি সম্প্রতি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং কিমাশ্চর্যম্! তিনি অন্তত এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বকৃত-মার্গ অনুসরণ করেননি। কোনো ব্যক্তিগত স্মৃতি, চিঠিপত্র নেই, নেই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে লেখা এবং লেখার আড়ালে লেখককে খোঁজার চেষ্টা। বাদবাকি যা রইল, তা হল, ভাষা, রচনাশৈলী, রচনার উপাদানসমূহ, কাহিনী কাঠামোর যুক্তি বিন্যাস এসবই তাঁর আলোচনার নিরিখ এবং এসবের জোরে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান : '…উজ্জ্বল গদ্য, শক্ত কলম, সন্দীপনের দুটোই আছে। এর সঙ্গে দরকার সংগঠন, চিন্তার সংগঠন, বক্তব্যের সংগঠন। স্বতন্ত্র হবার অলীক সাধনায় মাঝে মাঝে সন্দীপন তা ভুলে যান কেন ?' অস্যার্থ, ভাষা ঠিক আছে, সাহস আছে কিন্তু চিন্তা অবিন্যস্ত, বক্তব্য অসংলগ্ন / পৌনঃপুনিক / ক্লিশে। এবং স্বতন্ত্র হবার মিথ্যা চেষ্টায় সন্দীপন 'মাঝে মাঝে' তা ভুলে যান। অর্থাৎ, চিন্তা ও বক্তব্যে গঠন-দৈন্য কিছু-কিছু ক্ষেত্রে আছে, অনেক ক্ষেত্রেই নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য সরোজবাবুর মতো খ্যাতনামা সমালোচকের মূল্যায়ন বুঝতে এতটা পরিশ্রম করতে হল, বিশেষত এমন একজন লেখক সম্পর্কে,

যার নাম তিনি মাত্র কয়েকমাস আগে প্রকাশিত গল্প উপন্যাসের দশকওয়ারি আলোচনায় একবারের জন্যও উল্লেখ করেননি।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অতি যত্ন সহকারে সন্দীপনের আলোচ্য দুটি গ্রন্থ পড়েছেন। এমনকি উৎসর্গপত্রের হাস্যকর 'আমাদের সম্পাদক' জাতীয় শব্দদুটির প্রতিও বর্ষিত হয়েছে তাঁর সজাগ কটাক্ষ, যেমন গল্প সংকলনটির গোড়ায় প্রকাশিত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের কয়েকটি ক্ষেত্রের [ যেমন, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ] যাথার্থ ও কিছুক্ষেত্রে সন্দীপনের সুবিধাবাদী মনোভাবের ইঙ্গিত দান প্রভৃতি যত্নবান পাঠক / সমালোচক হিসেবে তাঁকে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করবে। মূলগল্প না হলেও [ উত্তর ] আধুনিক বিচারে এগুলিও টেক্সটের অন্তর্গত। যেমন, গ্রন্থের প্রচ্ছদপটও [ অন্য কেউ আঁকলেও ] টেক্সটের সহায়ক অংশ [ বোধগম্যতার দিক থেকে ]। আলোচ্য প্রবন্ধের শুরুতে আঁকা রয়েছে একটি কলম-তীরের ছবি [ আগেও সরোজবাবুর একটি লেখায় প্রায় একধরনের প্রতীক দেখা গেছে ]। জানি না, কোন লক্ষ্য ভেদ করবে? সন্দীপন কে?

কারণ, লেখার টেকনিক, ভাষা, 'ক্ষোভ যন্ত্রণা ক্রোধে ফর্ম কনটেন্ট ভেঙে চুরমার করে দেবার নিরীক্ষায় আলোচ্য লেখকের সাহস ও দুর্জয় দুরন্তপনাকেও তিনি স্বীকৃতি দেন। কিন্তু বিদ্ধ করেন, যখন কয়েকটি [ যৌনাঙ্গ, মূত্রত্যাগ, রমণ ] উপাদানের পৌনঃপুনিকতার অভিযোগ করে তিনি 'পেচ্ছাপ' সংক্রান্ত 'প্রায় কুড়িটি' [ আসলে এগারটি ] উদাহরণের ডালি সাজান। [ পরপর এতবার 'পেচ্ছাপ' কথাটা সম্ভবত আর কোনো বাঙালি লেখক / সমালোচক লেখেননি, সন্দীপনও নন। ]

সরোজবাবু এসবের জন্য ক্যামু ও সার্ত্রের 'অস্তিবাদ'কে [ জানি না, এটা ছাপার ভুল কিনা, কারণ ক্যামু / সার্ত্রের অস্তিবাদ ( positivism ) ছিল না, ছিল 'অস্তিত্ববাদ' ( existentialism ) ] দায়ী ঠাউরেছেন। অতি সম্প্রতি, সন্দীপন মার্কেজের ম্যাজিক-বাস্তবতায় আক্রান্ত। সরোজবাবু তার খোঁজও রাখেন নিশ্চয়ই। কথা হল, লেখক শুরু থেকে এ অবধি যে লেখক [ বিদেশী ঋণ মাথায় নিয়েই ] 'গোল গল্প' [ কথাটা সরোজবাবুরই ] ভাঙার সর্বাধিক চেষ্টা চালিয়েছেন [ সরোজবাবুকে আরেকবার 'কবি কর্ণপুর' জাতীয় 'ফর্মসর্বস্ব' লেখা পড়ে দেখতে অনুরোধ করি ], জনপ্রিয়তার একটি প্রধান উপাদান [ যৌনতা ] তাঁর অনায়াসলব্ধ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর সাহিত্য যে 'বাণিজ্যায়নের নির্বাসিন' লাভ করেনি, এজন্য বোধহয় সন্দীপন আরেকটু বেশি প্রশংসা দাবি করতে পারতেন, তাঁর 'কল্পনার দৈন্য' কিছু কিছু শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার সত্ত্বেও।

### উপসংহারের বদলে

এইভাবে, বাস্তবতাবাদী সমীকরণ ধার করে বলতে হয়, দেশ পাল্টাচ্ছে, যুগ পাল্টাচ্ছে, সংকটের চেহারা পাল্টাচ্ছে প্রতিনিয়ত; সব গান গাওয়া হয়ে গেছে, সব কথা সাঙ্গ হয়েছে—এই যে আবিল, অ-সরল উত্তর-আধুনিক সভ্যতা এখানে কোনো প্রেমিক সহজ-ভাবে 'আই লাভ য়ু ম্যাডাম' বলে আর প্রেম নিবেদন করতে পারে না, কারণ সে

( যদি মোটামুটি শিক্ষিত হয় ) জানে যে এটি তার 'নিজস্ব' কথা নয়, বারবারা কার্টল্যান্ড কর্তৃক অনেক আগেই তা লিখিত ভাষা [ এবং তার প্রেমাস্পদও তা জানে ]। অতএব [ উমবার্তো একোর মতে ] এই ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে তাকে উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েই বলতে হয়, যেমনটা, বারবারা কার্টল্যান্ড বলতেন, 'আই লাভ য়্যু ম্যাডলি।'

এই অসহায়, জটিল, বহুমাত্রিক সংকটের যুগে সমালোচনার ভাষা, তার তাত্ত্বিক পৃষ্ঠ-ভূমি অজর, অচল থাকতে পারে না, এক পাঠকের মধ্যে বিভিন্ন পাঠকের সন্নিবেশ করাই আধুনিক সমালোচনার প্রধান চ্যালেঞ্জ। □